আব্দুল বায়েস

‘ভোগ ও ভোগান্তি’

ওই গল্পটা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে।

এক লোকের হাতের মধ্যমায় ছিল স্বর্ণের আংটি। তার খুব শখ মানুষ জানুক যে সে স্বর্ণের আংটি পরেছে। একবার বাজারে গিয়ে পছন্দের জিনিস দোকানদারকে দেখাতে গিয়ে সে বারবার মধ্যমা দিয়ে নির্দেশ দিচ্ছিল, আরে, এইটা না ওইটা, ওইটার দাম কত ভাই? তার উদ্দেশ্য যে স্বর্ণের আংটি দেখানো, তা টের পেয়ে দোকানদার মুখ খিঁচিয়ে স্বর্ণের দাঁত দেখিয়ে বলল, ওইটার দাম ছে টাকা।

নিজের অর্থনৈতিক তাকত, বেশভূষা, পান্ডিত্য, পছন্দ প্রভৃতি প্রদর্শন করে নিজেকে আলাদা ভাবার মানসিকতা মানুষের চিরায়ত অভ্যাস।

সমাজে কিছু মানুষ চায় দেখাতে যে আয়, ব্যয়, সম্পদ, ক্ষমতা এবং ভোগে তারা অন্যদের কাছ থেকে একটু পৃথক। সুযোগ পেলেই বলবে ইজ্জত কা সাওয়াল; ইজ্জত হচ্ছে সামাজিক মর্যাদা, আভিজাত্য, অহংকার। আর এই পার্থক্যকরণের (Differentiation) কাজটি মূলত ঘটে দ্রব্য ও সেবা ভোগের মাধ্যমে। ছাত্রজীবনে ছায়াছবিতে দেখেছিলাম বাংলাদেশের ডাকসাইটে অভিনেতা গোলাম মোস্তাফা, খলিলুর রাহমান প্রমুখ (কিংবা ওপার বাংলার ছবি বিশ্বাস) ঠোঁটের কোণে পাইপ ঝুলিয়ে ছেলেটিকে বলছেন, ‘কত টাকা বেতন পাও যে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে?’ ছেলেটি কাঁপতে কাঁপতে একটা অংক বলার পর আবারো হুংকার—‘ওই টাকায় তো আমার মেয়ের কসমেটিকসের দামও হবে না। খাওয়াদাওয়া, গয়নাগাটি জুটবে কেমনে শুনি। সমাজে আমার স্ট্যাটাস সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে, ইউ স্কাউনড্রেল? বামন হয়ে চাঁদে হাত? এখনই বেরিয়ে যাও বলছি।’ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা কাঁচুমাচু বেরিয়ে যায়, দু-একটা ব্যতিক্রম বেয়াড়া বাদ দিলে।

যাক সে কথা। আমরা যে প্রতিনিয়ত দ্রব্য ও সেবা গ্রহণ করি, অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলে ভোগ করি, তা নিতান্তই উপযোগিতা বা তৃপ্তি পাওয়ার জন্য। যে জিনিসে তৃপ্তি বা আনন্দ নেই, বাজারে তার চাহিদা বা দামও নেই। এই ভোগ নিত্যপ্রয়োজনীয় কিংবা একটু-আধটু আমোদ-আহ্লাদের জন্য হতে পারে। আমাদের ভোগ দেয় বাজেট দ্বারা সীমিত। সুতরাং ভোগের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা বলার ভাগ্য খুব কম লোকের, বিশেষত বাংলাদেশে।

মার্কিন অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী থরস্টন ভেবলেন ২০০ বছর আগে দৃষ্টি আকর্ষক বা দর্শনীয় ভোগের কথা বলেছেন (Conspicuous consumption)। এ ধরনের ভোগের নাম দেয়া যায় ফুটানি। সরাসরি উপযোগিতা বা তৃপ্তি নেই, তবে এ ধরনের ভোগ পরোক্ষভাবে ‘আমি আলাদা’ জাতীয় হামবড়া মার্কা তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে সাহায্য করে। আর সেই সূত্রে সমাজের উঁচু আয়ের এক অংশ ক্ষমতার দাপট কিংবা সামাজিক অবস্থান তুলে ধরার জন্য বিলাসবহুল গাড়ি, বাড়ি, মদ, জুয়া, জুয়েলারি, এমনকি নারী ভোগ করে। তবে এসব ভোগের একটা ভোগান্তি আছে, যা একটু পরে আলাপ করব।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে ভেবলেনের নামানুসারে দ্রব্যের নাম রাখা হয় ভেবলেন দ্রব্য। এমনিতে তো চাহিদারেখা সাধারণত নিম্নগামী হয়—দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং কমলে বাড়ে, কিন্তু এই বিশেষ চাহিদারেখা একটা স্তরের পর নিম্নগামী না হয়ে উর্ধ্বগামী হয়। অর্থাৎ ক্রেতা বেশি দামে বেশি জিনিস কেনে। কারণ আর কিছুই নয়, দ্রব্যটির সামাজিক মান। আবার কেউ ভাবে বেশি দাম যখন নিশ্চয়ই, সেটা উন্নত মানের হবে (ডিজাইনার হ্যান্ডব্যাগ) অথবা হীরাখচিত হ্যান্ডব্যাগ, যার দিকে লোকজন হাঁ করে তাকিয়ে বলবে—বেটি একখান দেখাইল বটে। হুম, ফুটানির শেষ নেই।

তবে স্বীকার্য যে অতি উঁচুমাত্রায় ভোগবিলাস তথা দৃষ্টি—আকর্ষণীয়/দর্শনীয় ভোগ সমাজে প্রকট আয়বৈষম্যের নিদর্শক। এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের ভোগে সরাসরি উপযোগিতা থাকলে কথা ছিল না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দর্শনীয় ভোগ বা ফুটানি তা দেয় না। তৃপ্তি এটুকুই যে অন্যরা দেখছে আমার বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়ি, গলায় স্বর্ণের চেইন কিংবা হাতের আঙুলে হীরার আংটি এবং হয়তো বঞ্চিত হয়ে হায় আফসোস করছে। অন্যের আফসোসে আমার খুব তৃপ্তি লাগে! অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রায়ই এর পেছনে কাজ করে কালো অর্থনীতি থেকে প্রাপ্ত আয় যথা খাজনা (নিখাদ দালালি), ভূমি, নদী, জলাশয় জবরদখল, দুর্নীতিসমেত নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ড—এক কথায় যা আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে সাহায্য করে। এ ধরনের ভোক্তারা কর ফাঁকি দেয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খুনাখুনিতে জড়ায়, অর্থ ও মানব পাচারে লিপ্ত থাকে, পর্ণশিল্প খুলে বসে, টাকা উড়িয়ে রাজনীতি তথা ক্ষমতায় আসীন হতে হাঁকডাক করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এসব কর্মকাণ্ডে সমাজ ও সরকারের সায় নেই বিধায় তা বেআইনি উপার্জন বা কালো টাকা হিসেবে বিবেচিত।

এর সবচেয়ে ক্ষতিকারক দিক হচ্ছে, জেমস ডুসেনবেরির মতে, এ ধরনের ভোগ সমাজে ‘প্রদর্শন প্রভাব’ (Demonstration Effect) সৃষ্টি করে, যেখানে একজনের ব্যয় তার প্রতিবেশীর ব্যয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। কার্ল মার্ক্স একজন গরিব মানুষের কথা লিখেছেন, যে একদা এক ছোট কুটিরে বাস করত এবং বলা যেতে পারে সে বেশ সুখী ছিল। কিন্তু যখনই তার প্রতিবেশী প্রাসাদ নির্মাণ করল, লোকটির সুখের নদীতে ভাটা পড়ল, কারণ কুটিরটি (এবং তার মালিক) তখন বঞ্চনা অনুভব শুরু করে দিল। এর নাম আপেক্ষিক বঞ্চনা। সামাজিক মর্যাদা রক্ষায় মানুষ যখন ভোগ করে তখন আপেক্ষিক বঞ্চনার সৃষ্টি করে, যা প্রকারান্তরে দারিদ্র্য। সুতরাং এটা কোনো অস্বাভাবিক নয় যে একটা দরিদ্র খানার সন্তান বাবার কাছে কোনো এক নির্দিষ্ট নায়িকার পরনে দেখা জামা কিনে দেয়ার আব্দার নিয়ে হাজির হয়, একটা রঙিন টিভি বা স্মার্টফোন দাবি করে এবং বিফলে আত্মহত্যার হুমকি দেয়। সমাজের ভোগান্তি ওখানটায় আজ কিংবা কাল।

নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় ভোগের মতো দর্শনীয় ভোগ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাকায় জ্বালানি জোগায়। এগুলোর উৎপাদন কারখানায় লাখ লাখ শ্রমিক কাজ করেন, বেতন পান এবং বাজারে কার্যকর চাহিদা সৃষ্টি করেন। পৃথিবীতে নাকি বিলাসজাতীয় পণ্যের বাজার ৭ ট্রিলিয়ন ডলার।

দুই.

ইদানীং আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বেশ কয়েকটা ধরপাকড়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসছে। অভিযুক্তের খোঁজে তাদের বাসায় গেলে যে ধরনের দর্শনীয় ভোগের সন্ধান মিলল, তা দেখে রীতিমতো আক্কেলগুড়ুম; চোখ যেন চড়কগাছ। বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়ি, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্ষমতার দাপট, মদ, ইয়াবা এবং নারীতে আসক্তি—এসবই তাদের হাতের মোয়া যেন। বলা চলে বোধহয় যে সমাজের অন্যদের তুলনায় নিজেকে বড় করে তোলার জন্য নিবেদিত মানসিকতার নগ্ন রূপের বহিঃপ্রকাশ। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এ ধরনের হাতেগোনা কয়েকটা ঘটনা বরফের উপরিখণ্ড বা টিপ অব আইসবার্গ। বাংলাদেশে এ গোষ্ঠীর সংখ্যা কয়েক লাখ হতেও পারে। ব্যতিক্রম তো আছেই—পৃথিবীর সবচেয়ে ধনীদের মধ্যে অনেকে আছেন, যারা এমনতর ভোগের ধারেকাছে নেই। যেমন বিল গেটস, ওয়ারেন বাফেট প্রমুখ। বাংলাদেশেও এমন লোক আছে, তবে খুব সীমিতসংখ্যক বলেই ধারণা।

দৃষ্টি আকর্ষক বা দর্শনীয় ভোগে আপত্তি থাকার কথা নয়, অন্তত পুঁজিবাদী সমাজে তো নয়ই। সম্পদের মালিক ব্যক্তি, ভোগের মালিকও সে, তা কীভাবে পরিভোগ করবে, ওটা একান্তই তার ব্যাপার। তবে সেখানেও নাগরিকের প্রত্যেকটা কর্মকাণ্ড দেশের প্রচলিত আইন দ্বারা সিদ্ধ বা নিষিদ্ধ হয়ে থাকে। যেমন আমাদের দেশে মদ ক্রয় ও বিক্রয়ে বারণ নেই কিন্তু তার জন্য যথাযথ সংস্থার অনুমতি লাগবে। কোটিপতি হতে নিষেধ নেই কিন্তু নিয়মিত কর দিতে হবে। দশটা ফ্ল্যাটের মালিক হতে পারি কিন্তু এগুলো কেনার নিমিত্ত অর্থের উৎস দেখাতে হবে, এমনকি একাধিক বিয়ে করার নিমিত্ত নিয়মকানুন আছে।

পশ্চিমা জগতে ফুটানি জাতীয় ভোগ হইচই ফেলে না। কারণ কিছু ব্যতিক্রম বাদে ভোগকারী প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই ফুটানি মারে। যদি অন্যথা হয়, আইন সবার জন্য সমান। তাছাড়া ওসব দেশে ধনী হওয়া খুব কঠিন কাজ। কয়েক যুগ লেগে যেতে পারে। প্রতি পদে পদে নিয়মের বেড়াজাল, আইনের রক্তচক্ষু, পূর্ণ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কাটিয়ে সেখানে স্বাভাবিক মুনাফা ঘরে আসে। এর বিপরীতে বাংলাদেশে ধনী হওয়া যায় কয়েক বছরেই, এমনকি কয়েক মাসে—প্রতি পদে পদে অর্থের বিনিময়ে নিয়মের প্রাচীর ভেঙে ফেলা সহজ, ১ টাকার জিনিস ১ হাজার টাকায় সরবরাহ করা, কাজ শেষ না করেই পাওনা আদায়, ভূতের প্রকল্প বানিয়ে অর্থ লোপাট, মানুষকে বোকা বানিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, ব্যাংকঋণ নিয়ে সটকে পড়া এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ক্রয় বাবদ বাংলাদেশে এখন কালো অর্থনীতির জয়জয়কার চলছে বলে বিজ্ঞজনের মত।

মার্কিন অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী থরস্টন ভেবলেন ২০০ বছর আগে দৃষ্টি আকর্ষক বা দর্শনীয় ভোগের কথা বলেছেন। এ ধরনের ভোগের নাম দেয়া যায় ফুটানি। সরাসরি উপযোগিতা বা তৃপ্তি নেই, তবে এ ধরনের ভোগ পরোক্ষভাবে ‘আমি আলাদা’ জাতীয় হামবড়া মার্কা তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে সাহায্য করে। আর সেই সূত্রে সমাজের উঁচু আয়ের এক অংশ ক্ষমতার দাপট কিংবা সামাজিক অবস্থান তুলে ধরার জন্য বিলাসবহুল গাড়ি, বাড়ি, মদ, জুয়া, জুয়েলারি, এমনকি নারী ভোগ করে। তবে এসব ভোগের একটা ভোগান্তি আছে

তিন.

মোটকথা, ফুটানি-ভোগ নিয়ে আপত্তি নেই, যদি দেশে যথাযথ আইনের শাসন থাকে। নিন্দুকেরা বলে, দেশে আইন আছে, শাসনও আছে কিন্তু নেই শুধু আইনের শাসন। তা নেই বলেই নাকি ফুটানি নিয়ে এত হইচই—চ্যানেলগুলোর ক্যামেরা ধড়মড় এমন তাক করে থাকে যেন মঙ্গল গ্রহ থেকে কেউ ধরাতলে এসে ধরা পড়েছে। ফুটানি ছেড়ে ফুটতে পারলে বাঁচোয়া, যেমনটি ঘটেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়, কোটি কোটি টাকার গাড়ি-বাড়ি ফেলে ভোক্তা নিখোঁজ; এখনো তেমনটি দেখছি, যা অব্যাহত থাকলে আইনসিদ্ধ ফুটানির অস্তিত্ব টের পাওয়া যাবে আশা করি।

একমাত্র আইনের শাসন তথা সুশাসনই পারে এ ‘বিকৃত ভোগ’ বন্ধ করতে। তা না হলে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির গল্পটা যে গোলমেলে থেকে যাচ্ছে। আর একটা কথা—পাপীকে নয়, বরং পাপকে ঘৃণা করে সামনের দিকে এগোনোই ভালো। পাদটীকা: দর্শনীয় ভোগের ভুক্তভোগীদের বলি,

অতি বড় হতে নেই ঝড়ে পড়ে যাবে
অতি ছোট থাকতে নেই ছাগলে মুড়ে খাবে।

আব্দুল বায়েস: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও অর্থনীতির অধ্যাপক; ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির খণ্ডকালীন শিক্ষক